হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, নভেম্বর ২০০৯, কলকাতা ✿ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"আমাদের ধর্মচিন্তায় রাষ্ট্র, সমাজ, দেশ, জাতি অনুপস্থিত। এটাই সকল ব্যাধির উৎসমুখ। আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা রাষ্ট্র, সমাজ। আমাদের সব কিছু পাবার এবং দেবার ক্ষেত্র এই সমাজ।"

—শিবপ্রসাদ রায়

বনগাঁয় হিন্দুর জমি উদ্ধারে
সংহতি কর্মীদের কারাবরণ

হিন্দুর বাড়ী, জমি, নারী, পুকুর অন্য ধর্মের লোকরা দখল করে নেবে— হিন্দুরা তো যুগ যুগ ধরে এই দেখে এসেছে। কিন্তু হিন্দুরা সেটা গায়ের জোরে পুনরায় দখল করে নেবে— এ দৃশ্য দেখতে কেউই অভ্যস্ত নয়। বনগাঁর এড়োপোতা গ্রামের মানুষ সেই দৃশ্যই দেখল গত ২১ অক্টোবর। ঐ গ্রামের মিহির মণ্ডলের ৩২ শতক জমি ঐ গ্রামেরই শেখ সোলেমান মণ্ডল দখল করে নিয়েছিল ৩ মাস আগে। মিহিরবাবু থানা পুলিশ, এস ডি ও-বি ডি ও-পঞ্চায়েত কোথাও আবেদন করতে বাকী রাখেনি। কিন্তু এরকম ঘটনায় প্রতিকার পাওয়া তো যায় না। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সংখ্যালঘু যদি হিন্দুর সম্পত্তি দখল করে নেয়— তাহলে প্রশাসন সেটাকে সংখ্যালঘুর পবিত্র অধিকার বলে মনে করে। সে হিন্দুর বাড়ী হোক, আর নারী হোক। মিহির মণ্ডল রাজনৈতিক নেতাদের কাছেও বার বার গিয়েছেন। কিন্তু নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষতার মানে হল— মুসলমানের অন্যায় অন্যায় নয়। মুসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে কানে হাতচাপা দিতে হয়। সুতরাং মিহির মণ্ডল তাঁর জমি উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বনগাঁর বিভিন্ন ঘটনায় মানুষ হিন্দু সংহতির নাম জানতে পেরেছে। তাই মিহিরবাবু শেষ আশা হিসাবে যোগাযোগ করলেন সংহতি কর্মীদের সঙ্গে।

হিন্দু সংহতির কর্মীরা এর আগেই বনগাঁ

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

পার্ক সার্কাসে
আবার তিনটি মন্দির ভাঙল মুসলিম দুষ্কৃতিরা

কলকাতার পার্কসার্কাস এলাকায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের পেছনে রেললাইনের অপর পারে গোবরা এলাকা। সেখানে গত ২৯ অক্টোবর হিন্দুরা দেখতে পেল এক ঝলক পাকিস্তান। ঐ এলাকায় রামমোহন বেরা লেনে (কল-৪৬) বিপুল সংঘ ক্লাবের জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের হয়েছিল ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায়। একটি ছোট মসজিদ, নাম— মাদ্রাসা আরাবিয়া জামায়েতুল উলেমা— তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল মাইক ও বাজনা সহ শোভাযাত্রা। এই মসজিদ থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রার মাইক ও বাজনা বন্ধ করতে বলে। তাদের বক্তব্য, মসজিদের সামনে দিয়ে বাজনা বাজিয়ে যাওয়া চলবেনা। কিন্তু ক্লাবের ছেলেরা তাদের কথা অমান্য করে বাজনা বন্ধ করল না। তখন ঐ মসজিদের মাইক থেকে হেঁকে দেওয়া হল— 'ইসলাম খতরে মে, মসজিদে আক্রমণ হয়েছে, মুসলিম ভাইসব ছুটে এসো।' মুহূর্তের মধ্যে নিকটের আড্ডিবাগান থেকে রাত্রি ১০.৩০টায় ছুটে এলো প্রায় দুই হাজার মুসলমান। তারা এসে শোভাযাত্রার মাইক ও গেটের লাইটগুলি ভাঙল। বিপুল সংঘ ক্লাবের পাশেই আছে কালী মন্দির,

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

ব্যারাকপুরের বিধান পল্লীতে
পাকিস্তান তৈরীর অপচেষ্টা

পশ্চিমবঙ্গের বুকে আর কত মিনি পাকিস্তান তৈরী হবে? গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই কি সংখ্যালঘু তোষণনীতির ফলে পাকিস্তান হয়ে যাবে? বাঙালি হিন্দুকে কি আবার রিফিউজী হতে হবে?

ব্যারাকপুর পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডে বিধানপল্লী। বিধানপল্লী ও সম্পূর্ণ ৩ নং ওয়ার্ড ১০০ শতাংশ হিন্দু অধ্যুষিত। কোন মুসলমান সেখানে বসবাস করে না। ওই ওয়ার্ডেই বিধানপল্লীতে 'ভাঙা মসজিদ' নামে সম্পূর্ণ ভগ্নস্তূপ একটি ইটের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে রেললাইনের ধারেই ১৫ নং রেলগেটের পাশে। ওই কাঠামোতে বিগত ৬০ বছর ধরে নবারুণ বিদ্যামন্দির নামে একটি সরকারী প্রাথমিক স্কুল চলত। এই এলাকার বয়স্ক ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই ঐ স্কুলেই ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছেন। ছাত্রের অভাবে ২০০৭ সালে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। বিগত ৬৩ বছরে কোনদিন ঐ কাঠামোতে কোন নামাজ পাঠ হয়নি।

ঐ ভগ্নস্তূপের সঙ্গে সংলগ্ন শঙ্খ ভারতী ক্লাব

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

বারাকপুর বিধান পল্লীর সেই ভাঙা মসজিদ, যা আগে ছিল নবারুণ বিদ্যামন্দির।

প্রতিবাদে উত্তাল হাসনাবাদ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তের লাগোয়া শহর হাসনাবাদ। সেখানকার হিন্দুদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। মাত্র দু কিলোমিটার দূরে শাঁকচুড়া গ্রামের অসামাজিক মুসলিম দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে হাসনাবাদের মানুষ অতিষ্ঠ। হাসনাবাদ-টাকী পৌরসভার অর্ন্তগত বহু ক্লাবে ধুমধাম করে কালীপূজা হয়। কালীপূজার পর টাকী চৌরঙ্গির ক্যারামঘর ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানে শাঁকচুড়ার কয়েকটি মুসলমান ছেলে অশালীন আচরণ ও উৎপাত করছিল। ক্লাবের ছেলেরা তাদেরকে ঐ ফাংশান থেকে বের করে দেয়। পরের দিন সকাল ১০টায় ইছামতী নদীতে টাকী হঠাৎ কলোনী ইন্দিরা গান্ধী ক্লাবের ঠাকুর বিসর্জন হচ্ছিল। সেখানেও ইচ্ছাকৃতভাবে গণ্ডগোল সৃষ্টির জন্য শাঁকচুড়ার কিছু ছেলে উপস্থিত হয়। বিসর্জনের সময় তাদের গায়ে নদীর জল কাদা লেগে যায়। সেই নিয়ে তারা ওখানে গণ্ডগোল করে ও মার খেয়ে চলে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় হাসনাবাদের ফুটবল ময়দানে প্রতিবছরের মত আতসবাজী প্রদর্শনী চলছিল। কুড়ি পচিশ হাজার লোক সেই প্রদর্শনী দেখতে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় শাঁকচুড়া গ্রাম থেকে চার গাড়ী মুসলমান ও ১০-১২টি মটরবাইকে গুণ্ডারা এসে হঠাৎ কলোনীর ঐ ইন্দিরা গান্ধী ক্লাব আক্রমণ করে ও ভাঙচুর করে। ক্লাবের অনেক সদস্যকে মারধোর করে। ক্লাব সদস্য চিন্ময় মণ্ডল গুরুতর আহত হয়। যাত্রীবাহী বাসগুলোতে উঠে অস্ত্রের আস্ফালন দেখিয়ে ড্রাইভারদের গলায় পিস্তল ঠেকিয়ে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

এই খবর রাত্রের মধ্যে গোটা টাকী হাসনাবাদ শহরে ছড়িয়ে যায়। পরের দিন অর্থাৎ ২৫ অক্টোবর সকাল থেকে গোটা শহরে স্থানে স্থানে শুরু হয়ে যায় হিন্দুদের বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সভা ও মিছিল। খুব দ্রুত শহরে প্রায় ৩০টি ক্লাবের সদস্যরা একত্রিত হয়ে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের একটি বিশাল মিছিল নিয়ে গোটা শহর ঘোরে। আশপাশের গ্রাম থেকেও বহু হিন্দু যুবক এসে এই মিছিলে যোগ দেয়। এই মিছিল থেকে পরের দিন ২৬ অক্টোবর সোমবার টাকী হাসনাবাদ বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মিছিলের ঐ সংখ্যা ও হিন্দু যুবকদের মারমুখি চেহারা দেখে প্রশাসন ভয় পেয়ে যায়। তার থেকেও বেশী ভয় পায় ভাই ভাই করা দোআঁশলা হিন্দু নেতারা। তার আগের দিন চৌরঙ্গী ক্লাবের মঞ্চ থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদ সদস্য ও প্রাক্তন প্রধান সিরাজুল ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনেক ন্যাকাপনা করেছিল। তার পাশে বসেছিল টি এম

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

আমাদের কথা

লাভ্ জেহাদ– এক নিঃশব্দ সন্ত্রাস

কেরালায় এখন চলছে সি পি এম এর নেতৃত্বাধীন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের শাসন। সেকুলারবাদী বামপন্থী সরকারের পুলিশ স্বীকার করেছে যে, প্রেমের ফাঁদে পরিকল্পিতভাবে কেরালার হিন্দু মেয়েদের মুসলিম করার প্রক্রিয়া চলছে। এর পেছনে রয়েছে পিপল্স ফ্রন্ট অফ ইণ্ডিয়ার ছাত্র শাখা। এই সংগঠনটি মুসলিম মৌলবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মালয়ালাম দৈনিক পত্রিকা 'কেরালা কুমুদিনী'তে বিগত তিন বছরে চার হাজার হিন্দু মেয়ে নিখোঁজ হবার কথা প্রকাশ হতেই প্রশাসন নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হয়। মুসলমান প্রেমিকদের এহেন কীর্তি সাধারন্যে 'লাভ্ জেহাদ' নামে খ্যাত হয়েছে, যার একমাত্র উদ্দেশ্য শিক্ষিত হিন্দু মেয়েদের প্রলোভিত করে ধর্মান্তরিত করা ও বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজে লাগানো। যে মুসলমান যুবকেরা অস্ত্র নিয়ে জেহাদ করতে চায় না, তাদেরকে এইভাবে জেহাদ করতে প্রেরণা দিচ্ছে মুসলিম উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি টি কে শঙ্করণ কেরালা পুলিশ ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে মুসলমানদের 'লাভ জেহাদ' আন্দোলন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কোর্ট জানতে চেয়েছেন, গত তিন বছরে ঠিক কত হিন্দু মেয়ে কেরালা থেকে নিখোঁজ হয়েছে? 'লাভ জেহাদী'দের টাকার উৎস কি? কতজনকে লাভ জেহাদের ফাঁদে ফেলে নাশকতামূলক কাজে লাগানো হয়েছে?

সংবাদে প্রকাশ, দুই এম বি এ ছাত্রীকে প্রথমে ফাঁদে ফেলে পরে জোর করে কোজিকোড়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে মুসলিম ছাত্র সংগঠনের দুই ক্যাডার। ওই দুই হিন্দু ছাত্রীকে নাশকতার কাজে লাগানোর জন্যও চাপ দেওয়া হয়। মেয়েদের খুঁজে না পেয়ে, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় বিপর্যস্ত বাবা-মায়েরা শেষ পর্যন্ত কেরালা হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করে। এই মামলাতেই হাইকোর্ট উপরোক্ত আদেশ দেয়।

কেরালায় হিন্দু মেয়েদের বিশাল সংখ্যায় মুসলমানদের কবলে পড়ায় উৎকণ্ঠিত হিন্দু সংগঠনগুলি একযোগে 'লাভ জেহাদ' বিরোধী আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছে। হিন্দু সংহতির সহযোগী সংগঠন শ্রীরাম সেনার পক্ষ থেকে কলেজে কলেজে ব্যাপক পোস্টারিং ও লিফলেট বিলি করা হয়। অন্য হিন্দু সংগঠনগুলিও যথেষ্ট তৎপর। এখন কেরালার খ্রীষ্টান সংগঠনগুলিও লাভ জেহাদীদের দ্বরা কবলিত খ্রীষ্টান মেয়েদের উদ্ধারের জন্য হিন্দু সংগঠনগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। তবে এ ধরনের ঘটনা সংখ্যায় কম। লাভ জেহাদীদের মূল লক্ষ্য সুন্দরী ও শিক্ষিত হিন্দু মেয়ে। এই কাজে মুসলিম যুবকদের বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। এবং হিন্দু মেয়েদের প্রলুব্ধ করার জন্য এই লাভ জেহাদীদেরকে প্রচুর অর্থেরও যোগান দেওয়া হয়।

'লাভ জেহাদ' অর্থাৎ ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু মেয়ে কব্জা করা শুধু কেরালাতেই সীমাবদ্ধ নয় ভারতের সর্বত্র, বাংলার গ্রামে গঞ্জে চলছে, 'লাভ জেহাদী'দের নিঃশব্দ সন্ত্রাস। মেয়েদের স্কুল ও কলেজের সামনে জিনস প'রে মোটর বাইক নিয়ে এবং রাজা, বাপী, পলাশ প্রভৃতি হিন্দু নাম নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যে মুসলমান যুবকরা, তাদেরকে শুধু রোমিও অথবা শুধুই প্রেমাকাঙ্খী যুবক ভাবলে চরম ভুল হবে। এরা রোমিও নয়, এরা জেহাদী। সন্ত্রাস-বিস্ফোরণ এদের পদ্ধতি নয়, প্রেমের অভিনয় এদের পদ্ধতি। পিস্তল, আর. ডি. এক্স., গ্রেনেড এদের অস্ত্র নয়, মোটর বাইক, দামী সেল্ ফোন ও পকেটের কড়কড়ে নোট এদের অস্ত্র। আর এদের বড় অস্ত্র আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা, সব ধর্ম সমান, যত মত তত পথ, আর আমাদের অজ্ঞতা। এদেরই কবলে পড়ে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য সরল হিন্দু যুবতী—কিশোরীরা, আমাদের বোন-কন্যারাও। এর নাম 'লাভ জেহাদ'। দাদারা, ভায়েরা, পিতারা, মায়েরা সাবধান হন। শিক্ষকেরা সাবধান হন। 'সব ধর্ম সমান'— এ কুশিক্ষা বাড়ীতে ছোটদেরকে দেবেন না। বরং, প্রত্যেক ধর্মের মানুষের আচার আচরণ, রীতি-নীতি, অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাসের তফাৎ ছোটদের বোঝান। আমাদের নিকট প্রতিবেশী মুসলমানদের গোমাংস খাওয়ার অভ্যাস, বহুবিবাহ প্রথা, তিন তালাক এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণে অনীহার কথা ছোটদেরকে ভাল করে বোঝান। তা নাহলে 'লাভ জেহাদ' আপনার ঘরেও ছোবল মারবে। তখন কেঁদে কূল পাবেন না। চারিদিকে একটু চোখ কান খুলে দেখুন। অনেক মায়ের ফোঁপানো কান্নার আওয়াজ আর অনেক বাবার বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাবেন।

প্রথম পাতার শেষাংশ

....উত্তাল হাসনাবাদ

সির আর এক নেতা তুলসী চক্রবর্ত্তী। ২৫ অক্টোবর মহামিছিলে এদেরকে ধিক্কার দিয়ে শ্লোগান দেওয়া হয়।

২৫ তারিখ দুপুর থেকেই বিশাল সংখ্যায় পুলিশ ও র‍্যাফ শহরে নামে। প্রশাসন আপ্রাণ চেষ্টা করে ২৬ তারিখ যেন বন্ধ না হয়। কিন্তু সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে হাসনাবাদের জনসাধারণ ২৬ তারিখে অভূতপূর্ব বন্ধ পালন করে। শহরের কোন দোকান বাজার তো খোলেইনি, এমনকি কাঁচা সবজির বাজারও সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। রেল ও বাস পরিষেবা স্তব্ধ ছিল। অরাজনৈতিক আহ্বানে এরকম বন্ধ এই শহর আগে দেখেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় ১০ বছর আগে তপন কুমার ঘোষ যখন এখানে আর এস এসের বিভাগ প্রচারক ছিলেন তখন তিনি এবং হাসনাবাদ মহকুমা কার্যবাহ শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ ও অন্য সংঘকর্মীরা শহরের বিভিন্ন ক্লাবে গিয়ে সম্পর্ক করে ক্লাবগুলিকে একত্রিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তার ফল দেখা গিয়েছিল ২০০২ সালে গোধরা কাণ্ডের পর এখানে হিন্দুপ্রতিক্রিয়ায়। আর বর্তমানে তার একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা গেল।

টাকী পৌরসভায় হিন্দুর সংখ্যা ৮৫ শতাংশ হলেও সমগ্র হাসনাবাদ ব্লকে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। ২০০১ এর জনগণনাতে এই ব্লকে হিন্দু ছিল ৪৫.৪৪%, মুসলিম ছিল ৫৪.৪৮%। বর্তমানে ২০০৯ সালে হিন্দুদের অনুপাত আরও কমে গেছে। শুধু হাসনাবাদ ব্লকেই নয়, গোটা বসিরহাট মহকুমাতেই হিন্দুরা আজ সংখ্যালঘু ও অবরুদ্ধ। আর ঐ কুখ্যাত শাঁকচূড়া গ্রাম থেকে অনেক হুজি ও লস্করের জেহাদী সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়েছে। আরও বেশী সেখানে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। অনেক হিন্দু মেয়ে এই মহকুমায় আজ হারিয়ে গেছে কালো বোরখার অন্ধকারে। সীমান্তবর্ত্তী এই মহকুমায় হিন্দু আজ অবরুদ্ধ। দেওয়ালে তাদের পিঠ ঠেকে গিয়েছে। এখন তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়।

প্রথম পাতার শেষাংশ

বনগাঁয় হিন্দুর জমি উদ্ধারে ....

সংলগ্ন পাইকপাড়া, ট্যাংরা কলোনী, আড়সিংড়ি প্রভৃতি গ্রামে বহু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছে। এক্ষেত্রেও সংহতি কর্মীরা এড়োপোতা গ্রামে গিয়ে পরিস্থিতি দেখল এবং গ্রামের হিন্দুদের সঙ্গে আলোচনা কর। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে প্রশাসনের কাছে হিন্দুরা ন্যায্য বিচার পাবে না। সুতরাং নিজেদের শক্তিতেই ঐ জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে। সেইমত, ২১ অক্টোবর সকালে হিন্দু সংহতির ২০০ কর্মী এড়োপোতা গ্রামে পৌঁছাল। মিহির মণ্ডলকে আগেই বলে রাখা হয়েছিল যে তিনি যেন তাঁর জমির বৈধ কাগজপত্র নিয়ে ওখানে উপস্থিত থাকেন। সেইমত মিহিরবাবু জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়ে পরিবারের পুরুষেরা জমির কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। জমিতে গিয়ে দেখা গেল যে সোলেমান ও তার দুই ছেলে জমিতে লাঙল দিচ্ছে সরষে চাষ করবে বলে। মিহির মণ্ডলের সঙ্গে ২০০ সংহতি কর্মী জমিতে নামল। মিহিরবাবু ভালভাবে সোলেমানকে জমি থেকে উঠে যেতে বললেন। আশপাশে গ্রামের প্রায় ২৫০ মুসলমান জড়ো হয়েছিল। আর মিহিরবাবুর সঙ্গে ২৫-৩০ জন গ্রামের হিন্দু এসেছিল। সোলেমান ও তার ছেলেরা জমি থেকে উঠল না। তর্ক করতে লাগল। তখন তাদেরকে ঠেলে জমি থেকে তুলে দেওয়া হল। তারপর পূর্ব প্রস্তুতিমত জমিতে মেহগিনি গাছ, লম্বু বা ফলসা গাছ ও কলাগাছ লাগিয়ে দেওয়া হল এবং অন্য গাছের ডাল দিয়ে পুরো জমিটা বেড়া দিয়ে দেওয়া হল। সংহতি কর্মীদের দেখে জড়ো হওয়া মুসলিমরা ভয়ে কিছু করতে পারল না। কিন্তু তাদের রক্ষাকর্তারা বসে আছে উপরে—সেখানে তারা জানিয়ে দিল। ইতিমধ্যে গ্রামে যখন খবরটা ছড়িয়ে পড়ল যে মিহির মণ্ডলের জমি পুনরুদ্ধার হয়েছে, তখন সমস্ত হিন্দুদের ভিড় সেখানে ভেঙে পড়ল। প্রায় পাঁচশ হিন্দু জড়ো হয়ে গেল। যেন উৎসবের পরিবেশ। তখন পৌঁছাল পুলিশ। মিহির মণ্ডলের এতদিন এত আবেদন-নিবেদনে আসেনি। কিন্তু, এখন উপর থেকে রাজনৈতিক নেতাদের চাপ এসে গিয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষায় তৎপর পুলিশ এসে গেল। মুসলিমরা পুলিশের দিতে ইট ছুড়তে লাগল। পুলিশ তাদের দিকে তেড়ে গেল। কিন্তু তাদেরকে ধরল না। ধরল জমির মালিক মিহির মণ্ডল, স্বপন মণ্ডল ও পলাশ মণ্ডলকে এবং তার সঙ্গে হিন্দু সংহতির কর্মী অজিত অধিকারী, সুকান্ত ঠাকুর, বিনয় বিশ্বাস, হারান দেবনাথ ও মিহিরকে। মোট ৮জন হিন্দুকে পুলিশ গ্রেফতার করল। সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বনগাঁ থানার আই. সি. বললেন যে এলাকা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বিকাল সাড়ে পাঁচটার পর ছেড়ে দেওয়া হবে। জানাই ছিল যে ছাড়বে না। কারণ, পঃ বঙ্গের পুলিশ আইন অনুসারে চলে না। তারা রাজনৈতিক নেতাদের কথায় চলে। সুতরাং হিন্দু সংহতির কর্মীরা বিকালবেলায় বনগাঁ বাটা মোড়ে যশোর রোড অবরোধ করল। ভারত-বাংলাদেশের যোগাযোগকারী রাস্তা বন্ধ হয়ে গোটা বনগাঁ শহরের যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে গেল। দেড় ঘণ্টা অবরোধ চলার পর সন্ধ্যা ৬-টায় পুলিশ ও র‍্যাফ এসে প্রচণ্ড লাঠিচার্জ করে অবরোধ ভেঙে দিল ও সংহতি কর্মী সোমনাথ দে-কে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করল। পরের দিন অর্থাৎ ২২ অক্টোবর মোট ৯-জনকে কোর্টে তোলা হল। সেদিন দুপুরে হিন্দু সংহতির কয়েকশ কর্মী উপস্থিত কোর্টে। সকলের আশা যে বন্দীদের জামিন হবে এবং তাদেরকে বাড়ী নিয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন তাদের জামিন হল না। তখন বিকালে সংহতি কর্মীরা কোর্ট চত্বর ঘিরে ফেলল। মহকুমার হাকিম এ্যাডিশনাল চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (A. C. J. M.) মোল্লা আসগর আলীর নামে স্লোগান উঠল। অনেক কষ্টে তাঁকে পুলিশ কোর্ট চত্বর থেকে বের করে নিয়ে গেল। সংহতির স্থানীয় নেতৃত্ব ঘোষণা করল যে পরের দিন বনগাঁ বন্ধ ডাকা হবে। তখন থানার আই. সি. নিজে এসে কর্মীদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পরের দিন তাদের জামিন দেওয়া হবে। সুতরাং যেন বন্ধ না করা হয়। বনগাঁর বিশিষ্ট নাগরিক শ্রী অরবিন্দ বিশ্বাস ও শ্রী কিশোর বিশ্বাসের মধ্যস্থতায় বন্ধের আহ্বান স্থগিত রাখা হল। পরের দিন কলকাতা থেকে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ বনগাঁ পৌঁছলেন। তাঁর ও নিশীথ ঘোষের নেতৃত্বে সংহতি কর্মীরা মিছিল করে এস. ডি. পি. ও. অফিসে পৌঁছল। সেখানে আই. সি. ও. উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখা গেল যে তাঁরা জামিন না দেওয়ার জন্য অজুহাত তৈরী করছেন। তপন ঘোষের সঙ্গে ওই দুই অফিসারের প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হল। তাঁরা তপন ঘোষকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দিলেন। তপন ঘোষও উগ্রমূর্তি ধরে ওই অফিসারদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের আজ্ঞাবাহক বললেন। তারপর আবার এস. ডি. পি. ও. অফিস ও বনগাঁ জেলের বাইরে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হল। তখন পুলিশ নতি স্বীকার করে জামিন দেবে বলল। কিন্তু সেদিন 'পুট-আপ' এর সময় পেরিয়ে যাওয়ায় পরের দিন জামিন হওয়ার কথা হল। মাঝে শনি-রবি ছুটির দিন পড়ল। শেষ পর্যন্ত ২৮ অক্টোবর জামিন হল। কিন্তু বনগাঁ জেলের সুপারিন্টেন্ডেট আবুল্লা কালাম। সেখানেও বেল বন্ড সই করাতে দেরী করে দেওয়ায় সেদিন বন্দীদের জেল থেকে বের করা গেল না। অবশেষে ২৯ অক্টোবর সংহতির বনগাঁর প্রমুখ অজিত অধিকারীসহ সকলকে জেল থেকে মুক্ত করা গেল। মিহির মণ্ডলের ৩২ শতক জমি তাঁরই দখলে আছে। যদিও সেখানে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

পার্ক সার্কাসে ৩টি মন্দির ভাঙল.....

সেটাতে ভাঙচুর করল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দুপাড়ায়। প্রায় ২০-২৫টি হিন্দু বাড়ীর উপর আক্রমণ হল। ২০জন হিন্দু আহত। আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ এলাকায়। বিপুল সংঘ থেকে ৫০০ মিটার দূরে দাড়াপাড়ায় অধিবাস চৌধুরী লেনে শিবমন্দির ও কালী মন্দিরে দেবীমূর্তি ও ভাঙল হামলাকারীরা। হিন্দুরা সারারাত আতঙ্কে কাটাল। পরের দিন শুক্রবার। ঐ ছোট মসজিদটিতে প্রতি শুক্রবার সাধারণত ৪০-৫০ জন মুসলমান নামাজ পড়ে। কিন্তু ৩০ অক্টোবর শুক্রবার দুপুরে চারিদিক থেকে কয়েক হাজার মুসলমান এল ওখানে নামাজ পড়তে। গোটা রাস্তাটা দখল নিল তারা। হিন্দুরা ভয়ে থানায় কোন ডায়েরি করতে পারেনি। উল্টে সাতজন হিন্দুর বিরুদ্ধে লুঠপাটের অভিযোগে এফ আই আর করা হয়েছে। ৩রা নভেম্বর পার্কসার্কাস এলাকায় বৃষ্টি হয়। মুসলিম আক্রমণে যে সব হিন্দুর বাড়ী ভাঙা হয়েছিল তারা কোনরকমে প্লাস্টিকের ত্রিপল লাগিয়ে বৃষ্টি আটকায়। তখন

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

বুনো রামনাথের গল্প

তপন কুমার ঘোষ

নদীয়াতে তখন রাজত্ব করছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর নামেই কৃষ্ণনগর শহরটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্ব খুব বড়সড় ছিল না। কিন্তু নামডাক খুব ছিল। সকলে শ্রদ্ধার চোখে ওই রাজত্বকে দেখত। কারণ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের যেমন নবরত্ন সভা ছিল, তেমনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়ও নাম করা জ্ঞানীগুণীরা বিরাজ করতেন। মহারাজ জ্ঞানী ও গুণীদের কদর বুঝতে, সম্মান দিতেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন গুণগ্রাহী। তাই তাঁর রাজসভার গুণে ছটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়া তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল। প্রজাদের সঙ্গে তিনি স্নেহশীল পিতার মতই আচরণ করতেন। তাঁর রাজসভাতেই ছিলেন বিখ্যাত রসিক গোপাল ভাঁড়— যাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা আজও বাঙালি স্মরণ করে।

এহেন মহারাজার প্রধানা মহিষী অর্থাৎ মহারাণী একদিন রাগ করে গোঁসাঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। অন্নজল ত্যাগ করেছেন। রাজবাড়ীতে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন কেউ গিয়ে রাণীমার রাগ ভাঙাতে পারছে না। রাজার কাছে খবর গেল। মহারাজাও রাণীকে খুব ভালবাসতেন। তিনি ছুটে এলে প্রাসাদের অন্দরমহলে। রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? রাণীর কিসের অভাব? তাঁর রাগ বা অভিমানের কারণ কী? অনেক সাধ্য সাধনার পর জানা গেল, রাণীমার অপমান হয়েছে। মহারাণী হয়েও যদি অপমান সহ্য করতে হয়, তাহলে এ সোনাদানা হীরে জহরতের মূল্য কি? তাই তিনি গোঁসাঘরে ঢুকেছেন। তাঁর অপমানের প্রতিকার চাই। একথা শুনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রও বিচলিত হলেন। এক তো তিনি রাণীকে খুব ভালবাসতেন। তার উপর মহারাণীর অপমান মানে তো রাজারই অপমান। তাই তিনি ব্যাকুল হয়ে রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোথায় কিভাবে রাণীর অপমান হল? কে রাণীকে অপমান করল? তখন রাণীর দাস দাসীদের কাছ থেকে গটনা জানা গেল। রাণী গিয়েছিলেন গঙ্গাস্নান করতে। রাণী তো আর একা যান না। লোক লস্কর সান্ত্রী সেপাই দাস দাসী সহকারে রাণী স্নান করতে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলেন। মেয়েদের স্নানের ঘাট আলাদা। সুতরাং ঘাটে মোটামুটি ভিড় ছিল।

রাণীমা সদলবলে ঘাটে পৌঁছুতেই পালকি বেহারাদের হুম্ হাম আওয়াজ আর দাস দাসীদের কলকোলাহলে সকলের নজরে পড়ল যে রাণীমা এসেছেন গঙ্গাস্নানে। স্নানরত মহিলারা অনেক তাড়াতাড়ি স্নান নিয়ে উঠে গেল। যাদের তখনও স্নান হয়নি, তারা ঘাটের দুপাশে সরে গিয়ে রাণীমা ও তাঁর দলবলকে স্নানের জন্য জায়গা করে দিল। রাণীমা সদলবলে সেই বাঁধানো ঘাটে স্নান করতে নামলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন যে অন্য সব মহিলারা ঘাট ছেড়ে দিলেও একটা বৌ ঘাট ছাড়েনি। রাণীর দিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সেই বৌটা নিজের মনে স্নান করে চলেছে। রাণীর ভিতরে ভিতরে একটু রাগ হল। কিন্তু তবু তিনি কিছু বললেন না। হয়ত অল্প কারণে হম্বিতম্বি করা তখনকার রীতি ছিল না। তিনি আড়চোখে ঐ বৌটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, বৌ-টা একেবারেই নিরাভরণ। গায়ে কোন গয়না নেই। এমনকি হাতে শাঁখাও নেই। শুধু সধবার চিহ্নস্বরূপ বাঁহাতে লাল সুতো বাঁধা আছে। রাণীমা সখী পরিবৃত হয়ে স্নান করছেন। ওদিকে ঐ বৌ-টির স্নান হয়ে গেছে। তখনও এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে হাতে করে গামছা ধুচ্ছে। আর তাতেই বিপত্তি। সেই গামছার জলের ছিটে এসে লাগল রাণীর গায়ে। রাণী আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আগে থেকেই ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিলেন। এবার গায়ে জলের ছিটে লাগাতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। চিৎকার করে দাসীদেরকে বললেন, 'দ্যাখ তো মেয়েটা কে? মাগীর হাতে লালসুতো ছাড়া একগাছা শাঁখা জোটে না, তার এত দেমাক কিসের যে রাণীর গায়ে জল দেয়?' যেন গোখরো সাপের লেজে পা পড়েছে এইভাবে রাণীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সেই নিরাভরণ মহিলাটি। এবং ততোধিক তেজের সঙ্গে বলল— 'এই মাগীর হাতে এই লালসুতো আছে তাই নবদ্বীপের সম্মান আছে। তুমি রাণী বলে অত দেমাক দেখিও না। আমার হাতে এই লালসুতো যখন থাকবে না, তখন নবদ্বীপের এই সম্মানও থাকবে না।' এই কথা বলে বৌটা সদর্পে ঘাট থেকে স্নান সেরে উঠে গেল। ঘাট ভর্তি মহিলারা ঐ বৌটির কথাগুলো শুনল। তা দেখে রাণীমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তিনি মাথা নিচু করে ঘাট ছেড়ে উঠে এসে পালকিতে বসলেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে সোজা গোঁসাঘরে। খাওয়াদাওয়া বন্ধ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ঘটনা শুনে অবাকও হলেন, ক্রুদ্ধও হলেন। কে এই দেমাকী দরিদ্র মহিলা যার মহারাণীকেও অপমান করতে বাধে না! তিনি রাণীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ঐ মহিলাকে খুঁজে বের করা হবে, রাণীর অপমানের প্রতিকার করা হবে। তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে রাণীর রাগ ভাঙল। অন্নজল গ্রহণ করলেন।

রাজা চারিদিকে চর পাঠালেন ঐ মহিলাকে খুঁজে বের করতে এবং তার সম্বন্ধে সংবাদ আনতে। খবর আসতে বেশী দেরী লাগল না। খবর যা পেলেন তাতে রাজার মাথায় হাত। রাণীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁর অপমানের প্রতিকার করবেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রাখার তাঁর ক্ষমতা বা উপায় নেই। কারণ ঐ নিরাভরণ দরিদ্র মহিলাটি আর কেউ নন, পণ্ডিত বুনো রামনাথের পত্নী। মহারাজা জানেন, সেদিন ভরা ঘাটের মাঝে ঐ মহিলাটি যা বলেছেন—তা সত্যি। সত্যি তাঁর হাতের লালসুতো, অর্থাৎ তাঁর স্বামী বুনো রামনাথের জন্যই নবদ্বীপের সম্মান আছে।

সেইসময় সমগ্র উত্তর ভারতে জ্ঞানচর্চার দুটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। কাশী বা বারাণসী ও নবদ্বীপ। এই দুই স্থানের পণ্ডিতদের মধ্যে জ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চার প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত। দুই স্থানের পণ্ডিতরাই নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে কাশী থেকে এলেন এক মহাপণ্ডিত। তিনি দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছেন। পথে সমস্ত স্থানে সকল পণ্ডিতকে তিনি শাস্ত্র তর্কে পরাভূত করেছেন। পৌঁছেছেন নবদ্বীপ। নবদ্বীপের খুব নামডাক। তাই তিনি নবদ্বীপে এসে সেখানকার সব পণ্ডিতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা ও শাস্ত্রীয় বিতর্কের জন্য। তখনকার দিনে সারা ভারতে সংস্কৃত ভাষাতেই শাস্ত্রচর্চা হত। তাঁর আহ্বান শুনে নবদ্বীপের অনেক বড় বড় পণ্ডিত এগিয়ে এসেছেন। এবং সকলেই ঐ কাশীর পণ্ডিতের কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়েছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাপণ্ডিতও পরাজিত হয়েছেন। নবদ্বীপের মাথা নীচু হয়ে গিয়েছে। কাশীর কাছে নবদ্বীপ পরাজিত। নবদ্বীপের সম্মান ভুলুণ্ঠিত। রাজসভায় সকলে বিমর্ষ। রাজা মন্ত্রীর কাছে পরামর্শ চাইলেন—আর কি কোন উপায় নেই নবদ্বীপের সম্মান বাঁচানোর? ওদিকে কাশীর পণ্ডিত তাল ঠুকে চলেছেন—আ যাও, কৌন্ হ্যায়! মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, শেষ উপায় একটা আছে। কিন্তু সে বড় কঠিন কাজ।' রাজা উৎসুক— কি উপায় মন্ত্রীমশাই? আছেন আর কোনো পণ্ডিত আমার রাজ্যে যিনি এই পণ্ডিতকে তর্কে হারাতে পারবেন?' মন্ত্রী বললেন, 'আছেন মহারাজ'। রাজা— 'কি তাঁর নাম? কোথায় থাকেন তিনি? আমি তাঁকে চিনি না কেন?' মন্ত্রী— 'মহারাজ, তাঁর নাম বুনো রামনাথ। নবদ্বীপ রাজ্যের শেষ প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে কুটীর বেঁধে থাকেন তিনি। বিরাট বিদ্বান। জঙ্গলে থাকেন বলে লোকে তাঁকে বলে বুনো রামনাথ। তিনি কখনও নগরে আসেন না। তাই আপনি তাঁকে চেনেন না।' রাজা—তাহলে আপনি তাঁকে রাজধানীতে আনার ব্যবস্থা করুন। যেভাবে হোক নিয়ে আসুন। নবদ্বীপের সম্মান রাখতেই হবে।' রাজার আদেশে মন্ত্রী নিজে গেলেন পণ্ডিত রামনাথের কুটিরে। বনের মধ্যে প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় তপোবনের মত পরিবেশ। প্রশস্ত কুটির। রামনাথের পরিবার ছাড়াও ৩০-৪০ জন পড়ুয়া ছাত্র নিয়ে টোল। সেখানে অখণ্ড জ্ঞানের চর্চা চলছে। চলছে গুরু শিষ্য পরম্পরায় শাস্ত্র শিক্ষা। সে শাস্ত্র শুধু ধর্মশাস্ত্র নয়। তার মধ্যে থাকত ব্যাকরণ, দর্শন, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি ভৌতিক বিদ্যাও। প্রাচীন ভারতকে দেখার সৌভাগ্য যাদের হয়নি, তারা বিশ্বাস করবে না ভৌতিক শাস্ত্র ও জড় বিজ্ঞানের চর্চাতেও আমাদের মুনি-ঋষিদের কতটা দখল ছিল। যারা বুনো রামনাথের মত জ্ঞানতপস্বীদের দেখেছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস হত। এই প্রবন্ধের লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল এ যুগের বিংশ শতাব্দীর বুনো রামনাথকে দেখার। তাই এই লেখকের বিশ্বাস আছে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্বে ও মহত্বে। এই লেখক যে বুনো রামনাথকে দেখেছে, তিনি ছিলেন হাওড়া শিবপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রায়শঃ কাছার কাপড় খুলে যাওয়া ধুতি পড়া জামায় নস্যির দাগ লেগে থাকা হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ। দর্শন, সংস্কৃত, সাহিত্য, ক্যালকুলাস, রসায়নে যাঁর ছিল অবাধ গতি, সেই শিশুর মত সরল নিরাড়ম্বর জ্ঞানতপস্বীকে আমি দেখেছি। তাই তো ছোটবেলায় দাদুর মুখে বুনো রামনাথের গল্প শুনে বড় বয়সে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছি।

ফিরে আসা যাক গল্পে। মন্ত্রী গিয়ে রামনাথকে বিনম্র অনুরোধ জানালেন, রাজসভায় এসে কাশীর পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হতে। রামনাথ অরাজী। মন্ত্রী বললেন—রাজ্যের প্রজা হিসাবে রাজ্যের সম্মান বাঁচানোরও একটা দায়িত্ব পণ্ডিতের আছে। তাই তিনি যেন রাজার বিশেষ অনুরোধ রাখেন। তখন রামনাথ রাজী হলেন। কিন্তু দুটি শর্ত দিলেন তিনি। সেই শর্ত মানলে তবেই তিনি রাজধানীতে যাবেন ও শাস্ত্রীয় বিতর্কে অংশগ্রহণ করবেন। নবদ্বীপের সম্মান রাখতে ও রাজার আদেশ পালন করতে মন্ত্রী যে কোন শর্তে রাজী। শর্ত দুটো কি? প্রথম-রামনাথ কোন পারিতোষিক গ্রহণ করবেন না; রাজা যেন তাঁকে কোন পারিতোষিক অর্থাৎ পুরস্কার দেওয়ার চেষ্টা না করেন। (শাস্ত্রে এরই নাম অস্তেয় বা অপরিগ্রহ—যা ধর্মের অন্যতম লক্ষণ)। দ্বিতীয় শর্ত—যতদিন তর্ক চলবে তিনি রাজপ্রাসাদে তো থাকবেনই না, এমনকি রাজধানী শহরেও থাকবেন না। কারণ, পণ্ডিত নগরবাসকে পাপের বা অপবিত্রতার কারণ বলে মনে করতেন। তাই নগরের বাইরে কোন গ্রামে তাঁর নিবাস ব্যবস্থা করতে হবে। নিরুপায় হয়ে দুটি শর্তই মেনে নিয়ে মন্ত্রী পণ্ডিত বুনো রামনাথকে নবদ্বীপে নিয়ে এলেন। তাঁর কথামত নবদ্বীপের পাশে গ্রামে কোন একটি বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হল। রোজ সকালে স্নান-আহ্নিক-পুজো সেরে ভোজন করে রাজসভায় আসতেন এবং কাশীর সেই অহঙ্কারী পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিতর্ক করতেন। গোটা নবদ্বীপ এবং দূর দূর থেকে পণ্ডিত ও জ্ঞানপিপাসুরা, এমনকি কৌতূহলী সাধারণ মানুষও রাজসভায় ভিড় করতেন ঐ শাস্ত্রীয় বিতর্ক দেখার জন্য। মানুষদের মনে হত যেন কয়েকশ বছর আগে আদি শঙ্করাচার্য ও মন্ডন মিশ্রের বিতর্ক পুনরায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বিতর্কের আলোচনায় গোটা নবদ্বীপ গম্‌গম্ করছে। টানটান উত্তেজনা। কাশী বড় না নবদ্বীপ বড়?

টানা দশদিন ধরে বিতর্ক চলল। এঁর তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তর উনি দেন, তো ওনার জটিল প্রশ্নের উত্তর ইনি দিয়ে দেন। কে জেতে কে হারে? দশদিন বিতর্কের পর কাশীর পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। বুনো রামনাথের জ্ঞানের সামনে তাঁর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। নবদ্বীপের সম্মান বাঁচল। নবদ্বীপবাসীর মাথা আবার উঁচু হল। বুনো রামনাথের নামে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। কাশীর পণ্ডিত দিগ্বিজয় অভিযান ছেড়ে দিয়ে কাশী ফিরে গেলেন।

এত আনন্দেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিমর্ষ, মনমরা। পণ্ডিত রামনাথকে সম্মান জানানোর তাঁর কোন উপায় নেই। শর্তের বন্ধনে তিনি আবদ্ধ। রামনাথ ফিরে গেলেন তাঁর তপোবনে। কিন্তু রাজার মন ছটফট করছে। এতবড় পণ্ডিত তাঁর রাজ্যে আছে, অথচ তারজন্য তিনি কিছুই করতে পারছেন না। রাজা আবার পাঠালেন মন্ত্রীকে-যাও দেখে এস, যদি পরোক্ষভাবেও কোনপ্রকারে পণ্ডিতকে কিছু সাহায্য করা যায়। মন্ত্রীর উপর রাজার বড় ভরসা। মন্ত্রী আবার গেলেন। দেখলেন, যথারীতি কুটিরের সামনে বিশাল তেঁতুলগাছের নীচে ছায়ায় বসে রামনাথ ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। আর ব্রাহ্মণী বাড়ির ভিতরে মাটির গর্ত করা উনুনে বড় হাঁড়ি বসিয়ে চুলায় কাঠ ঠেলছেন। মন্ত্রী গিয়ে পণ্ডিতকে শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করলেন। তারপর নিবেদন করলেন যে মহারাজা তাঁকে পাঠিয়েছেন। তাঁর রাজ্যের মধ্যে এত নামকরা একটা টোল চলছে। এই টোল রাজ্যের গর্ব। তাই মহারাজ জানতে চেয়েছেন যে পণ্ডিতের কিছু অভাব আছে কিনা? শিশুর মত সরল রামনাথ এই প্রশ্নের অন্য অর্থ বুঝলেন। তিনি মন্ত্রীকে বললেন - কোন 'অভাব' তো আমি অনুভব করছি না। মীমাংসা, ন্যায়, ব্যাকরণ, দর্শন, সাহিত্য, বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি কোন শাস্ত্রজ্ঞানেরই 'অভাব' তিনি অনুভব করছেন না। মন্ত্রী বুঝলেন যে তাঁর প্রশ্নের অর্থ ঐ বিরাট পণ্ডিত বুঝতে পারেন নি। কারণ, তাঁর মনোজগত চিন্তাজগত বিদ্যা, জ্ঞান ও শাস্ত্র নিয়েই পরিপূর্ণ। তখন মন্ত্রী আরো খুলে বললেন যে এতগুলি ছাত্রদের ভরণপোষণের বিষয়ে কোন অভাব বা প্রয়োজনীয়তার কথা মহারাজ জানতে চেয়েছেন। পণ্ডিতের মাথায় ঢুকল। তখন তিনি বললেন- ওই অভাবের কথা তো আমি বলতে পারব না। ওটা ব্রাহ্মণী জানেন। তিনি বলতে পারবেন। আপনি বাড়ির ভিতরে গিয়ে ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করুন। মন্ত্রী ভিতরে গিয়ে ব্রাহ্মণীর চরণস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। ব্রাহ্মণী তখন কোমরে কাপড় বেঁধে উনুনে কাঠ ঠেলছেন। ৩০-৪০ জন ছাত্রের রান্না তাঁকে প্রতিদিনই করতে হয়। (আজকের আধুনিক মহিলারা হয়ত একথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু এটা সত্যি।) মন্ত্রীমশাই ব্রাহ্মণীকে বললেন মা, এতজন ছাত্রের প্রতিদিন অন্নের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হয়। তাই মহারাজ জানতে চেয়েছেন, এখানে কোন অভাব আছে কিনা! মহারাজ প্রতিদিন এখানে সিধে পাঠাতে চান। সিধে মানে চাল ডাল নুন তেল কাঁচাসবজি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণী যে একটু মুখরা ছিলেন সেকথা পাঠক আগেই জেনেছেন। মন্ত্রীর কথা শুনে ব্রাহ্মণী যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। খর্‌খর্ করে বলে উঠলেন- মন্ত্রী, তোমার রাজাকে বোল যে তার ভীমরতি ধরেছে। তাই তোমার মত মন্ত্রী রেখেছে। তোমার রাজার এত দুঃসাহস যে পণ্ডিতের ঘরে অভাব আছে কিনা জানতে চেয়েছে? শোন, তোমার রাজাকে বলে দিও যে যতদিন আমার ঘরের সামনে এই তেঁতুলগাছ আছে, ততদিন কোন অভাব হবে না। আমার ছেলেরা (মানে ছাত্ররা) গ্রাম থেকে চাল নিয়ে আসে। এই তেঁতুলগাছ যতদিন আছে, ততদিন মোটা চালের ভাত আর তেঁতুলপাতার ঝোল-এর অভাব কোনদিন হবে না। তোমার রাজাকে বলে দিও- পণ্ডিতের ঘরের অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করার দুঃসাহস যেন আর কোনদিন না করেন।' মন্ত্রীর মুখ ছোট হয়ে গেল, গলা শুকিয়ে গেল। মাথা নীচু করে নবদ্বীপে ফিরে এলেন। রাজাকে সব কথা বললেন। রাজা অধোবদন হয়ে গেলেন। পণ্ডিত বুনো রামনাথকে অনুগৃহীত করার সকল চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল।

তাই সেদিন নবদ্বীপের ঘাটে ব্রাহ্মণীর ঐ তেজ দর্শন করেছিলেন রাণী। এ তেজ, এ শক্তি ত্যাগের, তপস্যার ও অপরিগ্রহের। এরই নাম ধর্ম, যে ধর্ম শাস্ত্রের পৃষ্ঠা থেকে জীবনের প্রতিফলিত হয়েছে। একেই শিবপ্রসাদ রায় বলতেন ফলিত ধর্ম বা অ্যাপ্লায়েড ধর্ম।

শান্তিপুরে কালীঠাকুরের শোভাযাত্রা আক্রান্ত

মালোপাড়ার হিন্দুরা ফুঁসছে

বৈষ্ণবতীর্থ শান্তিপুর রাসযাত্রার জন্য বিখ্যাত হলেও নদীয়া জেলার এই শহরটিতে অসংখ্য কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে মালোপাড়ার শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীমাতা মন্দিরের বারোয়ারী কালী পূজা ১৫৬ বছরের পুরানো। এই ঠাকুর মালোপাড়ার প্রতিটি পরিবারের গৃহদেবতা। এবছর এই ঠাকুরের বিসর্জন শোভাযাত্রায় যে ঘটনা ঘটল তা মালোপাড়ার ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

১৮ই অক্টোবর সন্ধ্যায় শান্তিপুরের বহু কালীপূজার একসঙ্গে বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলছিল। প্রচণ্ড ভিড়ে শোভাযাত্রার গতি মন্থর ছিল। সবুজ সংঘ মোড়ে আরও বেশী যানজট সৃষ্টি হওয়ায় ঠাকুর ওখানে অনেকক্ষণ আটকে ছিল। শান্তিপুর থানামোড়ে একটি কালীপূজা হয়। তার নাম 'মাধব কালী'। কোন এক বাহুবলী মাধব সরকারের পরিচালিত হওয়ায় এর নাম মাধব কালী। অনেকেরই অভিযোগ যে এই বাহুবলী মাধব সরকার থানার অতি ঘনিষ্ঠ। আজ পশ্চিমবঙ্গের নপুংসক ঘৃণ্য পুলিশ প্রশাসন তাদের বহু অনৈতিক ও অবৈধ কার্যকলাপের জন্য থানায় থানায় মস্তান ও সমাজবিরোধী পোষে। তাই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ আজ পুলিশ ও সমাজবিরোধীকে একই চোখে দেখে।

বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মালোপাড়ার বারোয়ারী কালী ঠাকুরের পিছনে অন্য একটি ঠাকুর ছিল। তার পিছনে ছিল মাধবকালীর প্রতিমা। সবুজ সংঘ যানজটে সব ঠাকুরগুলিই আটকে গিয়েছিল। সেখানে মাধবকালীর ছেলেরা তাদের প্রতিমাটিকে নিয়ে মালোপাড়ার প্রতিমাটিকে ওভারটেক করে যেতে চায়। মালোপাড়া লোকেরা স্বভাবতঃই তাদেরকে রাস্তা ছাড়তে চায় না। তখন মাধবকালীর ছেলেরা, যাদের মধ্যে অনেকেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল, মারমুখী হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মালোপাড়ার ঠাকুরের উপর। মালোপাড়ার মানুষেরা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তারা হতভম্ব হয়ে যায়। তারা স্তম্ভিত হয়ে দেখে যে মাধবকালীর ঠাকুরের সঙ্গে শান্তিপুর সাড়াপাড়া-র বহু মুসলমান ছেলে। আক্রমণে তারাই অগ্রণী। প্রথমেই তারা মালোপাড়ার কালী প্রতিমার উপরেই আঘাত করে। দা দিয়ে প্রতিমার হাত ভেঙে দেয় এবং তারা প্রতিমার পাঁচভরি সোনার গহনা লুট করে নেয়। বাধা দিতে গিয়ে মালোপাড়ার বহু হিন্দু আহত হয়। মোট ১৭জন আহতের মধ্যে ৯জনকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। এদের মধ্যে বেচারাম হালদার ও বাবু হালদারের আঘাত গুরুতর। অস্ত্রের আঘাতে বেচারাম হালদারের মাথা ফেটে যায়। তার মাথায় ১১টা সেলাই পড়ে ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়। ১২দিন পর সে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়।

কালীঠাকুরের উপর এই আঘাত মালোপাড়ার মানুষের কাছে ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং ঠাকুর ওখানেই রেখে দেয়। তাদের দাবী- এই ঘটনার প্রতিকার চাই ও দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এই দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রতিমা বিসর্জন দেবে না। তারা ওখানে বসেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। কিন্তু পুলিশ তো এ ঘটনা ধামাচাপা দিতে চায়। কারণ, দুর্বৃত্ত ও পুলিশ পরস্পরের সহযোগী। তার উপর এখানে হামলাকারীদের অধিকাংশই 'সংখ্যালঘু ভাই' যাদেরকে চোখের মণির মত রক্ষা করাই হল ধর্মনিরপেক্ষতার প্রধান কর্তব্য। এই সংখ্যালঘুরা যদি ধানতলা বানতলা ঘটায়, বন্দেমাতরম বলতে অস্বীকার করে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দেয়, ভারতের বুকে আরও কয়েকটা পাকিস্তান তৈরী করতে চায়, তবুও তাদেরকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে। সুতরাং মালোপাড়ার মানুষদের দাবী পুলিশ কর্ণপাত করে না। ভোর চারটের সময় পুলিশ এসে হুমকি দিয়ে অবৈধভাবে জোর করে ভগ্ন প্রতিমা বিসর্জন করিয়ে দেয়। মালোপাড়ার পুরুষ ও মহিলারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে পাড়ায় ফিরে যায়। তারপর তারা '২০০- ২৫০ জন দল বেঁধে থানায় যায়। কোন ফল হয় না। পুলিশ ঠুঁটো। তারা দুর্বৃত্তের সহযোগী ও নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচারী। তাই স্বাধীন ভারতে হিন্দুর ধর্ম হয় লাঞ্ছিত, দেবী প্রতিমা হয় ভাঙা। এই ঘটনার পর মালোপাড়ার হিন্দুরা হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

আমতায় আবার হিন্দুরা আক্রান্ত

হাওড়া জেলার আমতা থানার ভান্ডারগাছা খেজুরতলা গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা ভোলা হাজরা। গত ৯ই অক্টোবর শনিবার দুপুরে বাড়ীর পাশেই পুকুরে ২.৩০টা নাগাদ স্নান করছিলেন। আচমকা কিছু বোঝার আগেই এলাকায় কুখ্যাত সেখ মমতাজ ও তার তিন ভাই উলফাজ ওরফে বাবলু, ফকির ও মশাই— চারজনে ভোলাবাবুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চলে প্রচণ্ড মারধোর, অকথ্য গালাগালি, লাথি, ঘুষি। ভোলাবাবুর চিৎকার শুনে ছুটে আসে স্থানীয় কিছু মানুষ এবং ভোলাবাবুর স্ত্রী। ভোলাবাবুকে ছাড়াতে গেলে তাঁর স্ত্রীর ব্লাউজ ছিঁড়ে দেয় ও শ্লীলতাহানি করে ঐ চারজন মুসলিম যুবক। তাদের অভিযোগ— ওদের বোনকে (যে ৩ জন ছেলের মা, বয়স ৩২/৩৩ বছর) টোন করেছে ঐ ভোলাবাবু। ভোলাবাবু বারবার বলা সত্ত্বেও ঐ বোনকে একবারও ডেকে জানতে চাওয়া হয়নি। এরপর আমতা থানাতে খবর দিলেও থানা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। পরে ভোলাবাবুর কাকা ও পাড়ার কয়েকজন থানায় গিয়ে সমস্ত ঘটনার কথা জানাতে গেলে পুলিশ সকলকে থানায় আটকে রাখে। পুলিশ বলে— ''পরোপকার করতে গেলে জেলে ভরে দেব।'' ঐ মুসলিম যুবকরা যে ৪টে সোর্ড ও ২টো পিস্তল নিয়ে বেরিয়েছিল তা থানাতে জমা রাখার দাবী করলে পুলিশ বলে যে মুসলিমদের বাড়ীতে সোর্ড ও পিস্তল থাকতেই পারে। পরে বিকালে পুলিশ এলাকা থেকে ঘুরে যাওয়ার পর ৭টার সময় আটক হিন্দুদের ছেড়ে দেয়। এদিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভোলাবাবুকে প্রথমে আমতা হাসপাতালে নিয়ে গেলে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে। ঐ রাত্রেই উলুবেড়িয়া থেকে কলকাতা মেডিকেলে আনা হয়। সেখান থেকে পিজি হাসপাতালে ট্রান্সফার করে।

পরের দিন ১০ই অক্টোবর রবিবার ভান্ডারগাছা খেজুরতলা ও আশপাশের গ্রামের মহিলারা সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্য্যন্ত আমতা রাণীহাটী রুট (অশ্বত্থতলা স্টপেজ) অবরোধ করে রাখলে তারপর ঐ মুসলিম চার ভাইদের মধ্যে দুজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং দুজন গা ঢাকা দেয়।

পিজি হাসপাতাল থেকে ভোলাবাবুকে মাত্র দুদিন পরেই অসুস্থ অবস্থাতেই জোর করে ছুটি দিয়ে দেয়। তারপর গ্রামের ১০/১২ জন পুরুষ ও মহিলা উলুবেড়িয়া হাসপাতালে গিয়ে চাপ তৈরী করলে ৭দিন ভর্তি রাখে। একমাস হয়ে গেলেও ভোলাবাবু এখনও ভালোভাবে হাঁটাচলা করতে পারছেন না। চোখে ঝাপসা দেখছেন। চিকিৎসা ঠিকমত হচ্ছে না। অথচ ফকির সুস্থ থাকা সত্ত্বেও আট দশদিন উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি রাখে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক দল ও নেতাতে তাদের ঘেন্না ধরে গেছে। নেতারা মিটমাট করার প্রস্তাব নিয়ে এলেও এলাকার সকল শ্রেণীর মানুষ একজোট হয়ে নেতাদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে।

তৃতীয় পাতার শেষাংশ

ব্যারাকপুরে পাকিস্তান তৈরীর....

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ও পঞ্জীকৃত। ভগ্নস্তূপের অন্যপাশে ২৫ গজের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। রেললাইনের অন্য পাড়ে শাঁখারীপাড়া। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির সর্বনাশা ধর্মনিরপেক্ষতার মূল্য দিতে গিয়ে ঢাকার শাঁখারীপট্টি থেকে উৎখাত হয়ে আসা রিফিউজীরা ওই পাড়ায় থাকেন। ওই পাড়াতেও কোন মুসলমান থাকে না।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে এলাকার এম. পি. শ্রী তড়িৎ বরণ তোপদার কিছু বহিরাগত মুসলমান নিয়ে এসে সমবেত পল্লীবাসীর সামনে তাল ঠুকে বললেন যে —এই ভাঙা মসজিদে আজ থেকে মুসলিমরা নামাজ পড়বে; আমি চ্যালেঞ্জ করছি কার ক্ষমতা আছে বাধা দিয়ে দেখুক। পল্লীবাসী স্তম্ভিত। শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্যাডাররা বাক্যহারা। আর উপস্থিত নপুংসক পুলিশ প্রশাসন পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে থাকল।

সকলেই বুঝতে পারল যে মসজিদ তৈরী হলে শঙ্খ ভারতী ক্লাবের সব পূজা বন্ধ হয়ে যাবে, ক্লাবটাই উঠে যাবে। ভারত সেবাশ্রম সংঘ বন্ধ হয়ে যাবে। ওখানে নামাজীদের পিছু পিছু দোকান বসবে। রাত্রে থাকা শুরু হয়ে যাবে। সামনে রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যার পর মা বোনেরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবে না। তারপর— পলায়ন, মাইগ্রেশন, এলাকা ছাড়া, বাড়ী জমি বিক্রি করে দেওয়া। আর সর্বশেষে— এই জায়গাটা মুসলিম স্থান হয়ে যাওয়ার পর রিফিউজী। সিপিএম নেতা এই তড়িৎ বরণ তোপদার নিজেও একজন রিফিউজী। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় তাঁর জন্ম। এত মুসলিম প্রীতি নিয়েও তিনি ও তাঁর পরিবার সেই নেত্রকোনায় থাকতে পারেন নি। হিন্দুপ্রধান ব্যারাকপুরে এসে রাজনীতি করে নেতা হয়েছেন ও গুছিয়ে নিয়েছেন। আর তারপর এখন ব্যারাকপুরকে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা তৈরি করার কাজে লেগেছেন। ঐ বিধানপল্লীর বয়স্ক মানুষেরা এই তড়িৎ তোপদারকেই নেতা বানিয়েছিলেন। সেই বিষবৃক্ষের ফল আজ তাদের বংশধরদের খেতে হবে।

কোন রেকর্ডে এটা মসজিদ বলে নথিভুক্ত নেই। এলাকার বাইরের কয়েকজন মুসলমান রাজ্য ওয়াক্ফ বোর্ডকে আবেদন করেছে এটিকে ওয়াক্ফ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। ওয়াক্ফ বোর্ড বলেছে - তারা এটা বিবেচনা করে দেখছে। এসব তথ্য সরকারী অফিসাররা অর্থাৎ S. D. O. এবং টিটাগড় থানার I. C. জানেন। কিন্তু এই কাপুরুষ অফিসার ভোটলোভী রাজনৈতিক দলের ক্রীতদাসের মত আচরণ করছে এবং এলাকার শান্তিকামী প্রতিবাদকারী নাগরিকদের হুমকি দিচ্ছে। জঙ্গলমহলে গেলে এদেরই গলার আওয়াজ মিঁউ মিঁউ হয়ে যায়।

এলাকার যুবকেরা হিন্দু সংহতির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং ঐ ভাঙা মসজিদের পাশেই অধ্যাপক তথাগত রায়কে নিয়ে হিন্দু সংহতির জনসভা করেছেন। সংহতির এই বিষয়ের প্রচারপত্র সেখানে বিলি করা হয়েছে। এলাকায় জাগরণ ঘটেছে। টিটাগড় থানার পুলিশ ঐ প্রচারপত্রকে নিয়ে তপন ঘোষের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুর কোর্টে ১৫৩ এ নং ধারায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছে।

প্রথম পাতার শেষাংশ

পার্ক সার্কাসে....

তারা কয়েকজন গিয়ে থানায় ডায়েরি করে।

এই পার্কসার্কাস এলাকাতেই ২০০৭ সালের ২১শে নভেম্বর তসলিমা নাসরিনকে বিতাড়নের দাবীতে কংগ্রেসী ইদ্রিস আলির নেতৃত্বে মুসলিমরা তাণ্ডব করে। এখান থেকে বহু হিন্দু নিজেদের বাড়ী বিক্রি করে অন্য এলাকায় চলে গিয়েছে। অনেক গলি, অনেক পাড়া হিন্দুশূন্য হয়ে গিয়েছে। এই এলাকায় বাকী হিন্দুরাও এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে।

সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম

বুক স্টল ঃ দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সময় সংহতির কর্মীরা স্থানে স্থানে বুক স্টল তৈরী করেন। তার মধ্যে কলকাতার বাগুইআটী, নারায়ণপুর এবং জেলাগুলিতে বনগাঁ, আমতা, বাগনান, জঙ্গলপাড়া ও মসাটে বুকস্টল চালান কর্মীরা।

বিজয়া সম্মেলন ঃ বেহালা, মল্লিকবাজার, আলমবাজার ও গোবরা ; জেলাগুলিতে ভবানীপুর, বনগাঁ, মালঞ্চ, নৈনানপুর, কুল্পী, বাগনান, আমতা, ডানকুনিতে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকেন বারিদবরণ গুহ, সাগর বাগ, উপানন্দ ব্রহ্মচারী, চিত্তরঞ্জন দে, তপন ঘোষ, ডাঃ দীপঙ্কর পতি, অমল কান্তি বসু, অজিত অধিকারী ও প্রকাশ চন্দ্র দাস।

পুরী বৈঠক ঃ হিন্দু সংহতির রাজ্য কোর কমিটির তিন দিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পুরীতে স্বর্গদ্বারে এক গেস্টহাউসে। ১৪ জন কোর কমিটির সদস্যকে নিয়ে এই বৈঠকে ৩০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ও সংগঠনের দ্রুত ক্রমবর্ধমান কাজ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com